21 AUG 2017

এমএ বাকী খলীলী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কত কথা

পাঁচ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি মনের তাগিদে। কদাচিত গিয়েছি এই পাঁচ বছরে। তবে সব সময়ই অনুসরণ করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। গত দু-তিন সপ্তাহে পত্রপত্রিকায় এবং টেলিভিশনে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সূত্রপাত উপাচার্য নির্বাচন নিয়ে।

অভিযোগ উঠেছে, সিনেটে নির্বাচন অসম্পূর্ণ সিনেট দিয়ে হয়েছে। গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নেই। কলেজ প্রতিনিধি নেই। অনেক কিছু নেই। ইচ্ছা করলে বর্তমান উপাচার্য করতে পারতেন। তিনি ওগুলো না করে বড় অপরাধ করেছেন! অভিযোগ উঠেছে, প্যানেলের অন্য সদস্যদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে উপাচার্য হওয়ার। কত কথা! অনেকে পত্রিকায় লিখেছেন; অনেকে টিভিতে অনেক কথা বলেছেন। এটিএন নিউজের মুন্নী সাহার ঢাবি সম্পর্কীয় একটি প্রোগ্রামের টাইটেল নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমি প্রোগ্রামটি দেখেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, সাংবাদিকরা তো বিশ্লেষণমূলক তির্যক আলোচনা করবেন এটাই তো স্বাভাবিক! অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবেন তারা। উত্তর দেবেন আলোচকরা, প্রতিষ্ঠান, সরকার, নীতিনির্ধারকরা। বিভিন্ন মতামত দেখেছি, শুনেছি ও পড়েছি।

এবার একটু ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করি। বর্তমান উপাচার্য নির্বাচনের তিনটি দিক রয়েছে– আইনগত, বিবেক ও স্বার্থগত। আইনের দিক থেকে কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে বলে মনে হয় না। প্রশ্নটি হলো স্বার্থ আর বিবেকের। যারা আপত্তি করছেন, তারা সম্ভবত বিবেকের তাড়নায় করছেন। সেটা ধরে নিলে আমার জন্য ভালো, কারণ অনেকেই আমার সাবেক সহকর্মী। শিক্ষকরা বিবেকের তাড়নায় করবেন, এটাই আশা করা মঙ্গল। উপাচার্য মহোদয়ের আচরণ অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্যানেল দেখে অনেকের কাছে মনে হবে, বর্তমান উপাচার্য নিজের পুনর্নিয়োগ নিশ্চিত করতে এ রকম প্যানেল করেছেন। তৃতীয়বারের মতো উপাচার্য হতে চাইলে উপাচার্যকে আরও পরিষ্কার এবং প্রশ্নহীন নির্বাচন করা উচিত ছিল। শুধু আইনের কথা নয়; মর্যাদার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছে সমাজ তো এটাই দেখতে চায়, যদিও আমাদের আচরণ অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন করে। আমার লেখাটার উদ্দেশ্য প্রধানত উপাচার্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলা। আশা করি, আমার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বলার অধিকারটুকু এখনো আছে। ওখানে যে আমার প্রাণ রয়ে গেছে; ওখানে যে কাটিয়েছি ৪৩ বছর; ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে। দেখেছি, বুঝেছি এবং অপারগ হয়েছি কখনো কখনো।

বাংলাদেশের অনেক অর্জন, সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নতি। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা বেড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বেড়েছে। মধ্যম দেশের মর্যাদা পাচ্ছি। যখন ঘোষণাটি আসে যে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম দেশের মর্যাদা পেয়েছে, সেই সময় স্কটল্যান্ডের এক অধ্যাপকের সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ হয়; লাঞ্চ করতে করতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'তোমাদের শহরের পরিবেশ, রাস্তাঘাট দেখে মনে হয় না এই দেশটা মধ্যম আয়ের দেশ। সর্বত্র কেমন যেন বিশৃঙ্খল অবস্থা!' আমার উত্তর খুব বেশি কিছু ছিল না। অনেক আলোচনার মধ্যে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রশ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নিয়ে। তিনি অনেকটা দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অক্সফোর্ড অব ইস্টের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে। পত্রিকায় দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন পৃথিবীর দুই হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও নেই। বছরদশেক আগে বিদেশে এক কনফারেন্সে এক পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদ (এক সময় PIDE-তে কর্মরত ছিলেন) লাঞ্চের সময় বলেছিলেন, 'আমরা অর্থনীতি তোমাদের কাছ থেকে শিখেছি। আগের মতো তোমাদের সেই খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষক নেই কেন? আমি তো তোমাদের BIDS এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সব সময় খোঁজ রাখি।' আমি দুই বিদেশির উক্তি উল্লেখ করলাম নিজেদের দিকে তাকানোর জন্য; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকানোর জন্য।

পত্রপত্রিকায় যেসব লেখা দেখেছি এবং টেলিভিশনে যেসব আলোচনা শুনেছি তা খুব সুখপ্রদ নয়। অনেক অভিযোগ। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে গবেষণার অপ্রতুলতা, শিক্ষক রাজনীতি থেকে শুরু করে ছাত্র-শিক্ষক দ্বন্দ্ব। সবকিছু আলোচনায় এসেছে। দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে; কোনোটা শুধু উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবে; আবার কোনোটা জ্ঞান সৃষ্টি ও চর্চার ক্ষেত্র হবে। একটা দেশ আসলে কত উন্নত এবং কতটা মেধা ও মননশীলতাভিত্তিক, তা নির্ভর করে উচ্চশিক্ষায় কত সুন্দর প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে পাঠদানের পাশাপাশি জ্ঞান সৃষ্টি এবং চর্চার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। এমন বিশ্ববিদ্যালয় তো দেখতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে। এক সময় এটা তো ছিল; এখনো আছে তবে মাত্রায় কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামগ্রিকভাবে সেখানে পৌঁছাতে হবে। অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন; যাদের অনেকে নিতান্ত নিজেদের তাগিদে, কাজ করেন খুবই সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে। এতে অনেকে তাদের নিজস্ব অর্থও ব্যয় করেন।

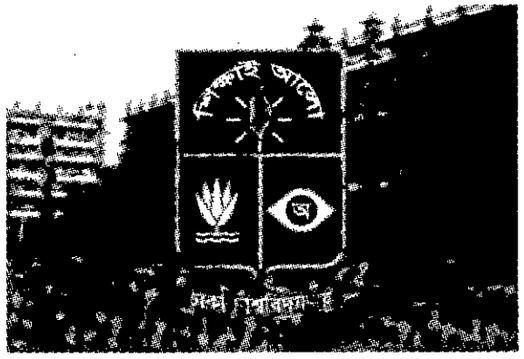

পত্রপত্রিকায় বা টেলিভিশনে যেসব আলোচনা হয়েছে এবং যেসব সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সমস্যাগুলো সঠিক। রাজনীতি প্রতি পর্যায়ে; বিভাগ থেকে অনুষদ; অনুষদ থেকে উপাচার্য পর্যন্ত। এটাই বাস্তবতা। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স

১৯৭৩ প্রস্তুত করেছিলেন তাদের কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছেন। আমার ধারণা, তারা মনে করেছিলেন, প্রশাসনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে, পাকিস্তান আমলের অগণতান্ত্রিক কার্যাবলি বন্ধ হবে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করবে। এই আশা তো দেশের সবচেয়ে শিক্ষিতদের কাছ থেকে করা যায়! কিন্তু একটি বিষয় সম্ভবত সঠিক যে, প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলে, সে ব্যবস্থা সুশাসন এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে না। সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে এটার প্রয়োজন থাকতে পারে না। বোঝার জন্য খুব বেশি চিন্তা করা লাগে না। যদি এই ব্যবস্থা সরকারি প্রশাসনে চালু করা হয় যে, মন্ত্রণালয়ে সচিব নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে তা হলে প্রশাসন কোথায় যাবে? যদি নিয়ম করা হয় যে, পুনর্নিয়োগ ভোটের মাধ্যমে হবে তা হলে কী হতো! সচিবের আচরণ কী হবে তখন! অধীনস্থ কর্মচারীদের আচরণ কী থাকবে তখন? সুশাসন থাকবে তো! অতি গণতন্ত্রায়ন এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামগ্রিকভাবে কলুষিত করেছে।

যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যারা ১৯৭৩-এর অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করেছিলেন, তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন, ব্যক্তি তার নিজস্ব আদর্শ নিয়ে চলবে স্বাধীনভাবে ও ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে এবং শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা করে শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনা করবেন। যে ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে তাঁরা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন সেটি সঠিক ছিল না, তা আমরা বুঝি এখন। কারণ বাইরের জাতীয় রাজনীতির প্রভাব আছে প্রকট। অনেকেই আমরা বুঝি এখন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যখন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে যায়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ব্যাহত হয়। এটাই হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। যে কারণে শিক্ষক নিয়োগে অসঙ্গতি থাকে এবং মেধা অনেক ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় না। হয়েছেও স্বজনপ্রীতি নিয়ত হচ্ছে। এ ছাড়া আমরা অনেক সময় দেখি, অনেক শিক্ষক পূর্ণ সময় ক্লাস নিচ্ছেন না; আবার কখনো কোনো নোটিশ না দিয়ে ক্লাসে আসেন না। এটাও একটা বাস্তবতা। আমি নিজে দেখেছি, শিক্ষক লাউঞ্জে বসে আলোচনা চলছে; ছাত্রছাত্রীরা লাউঞ্জে উঁকি দিচ্ছে। জানতে চায়, স্যার ক্লাস নেবেন কিনা? স্যার বললেন, মিটিংয়ে ব্যস্ত, ক্লাস নিতে পারবেন না। পরে মেকআপ ক্লাস নেবেন। অনেক সময় এক প্রবন্ধের অনেক লেখক থাকে। প্রমোশনের সময় কীভাবে বিবেচিত হবে? প্রথমদিকে নিয়ম ছিল, প্রথম লেখক পূর্ণাঙ্গ পয়েন্ট পাবেন, অন্যান্য লেখক ক্রমানুসারে কম পয়েন্ট। পরে সেটি বদলিয়ে এখন সবাই পূর্ণাঙ্গ পয়েন্ট পাবেন। পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি আছে। এটির যে চরম অপব্যবহার হচ্ছে তা সবাই জানে। এটাও তো একটা বাস্তবতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিদেশে পড়তে যায় এবং ৯০ ভাগ ফিরে বলে মনে হয় না। আমি যখন আমেরিকা থেকে ফিরি, তখন এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, তুমি মনে হয় বোকা, যে আমেরিকা থেকে পিএইচডি করে দেশে ফিরেছে। অনেকের না ফেরার অনেক কারণ আছে এবং থাকবে। আবার কেউ কেউ ফিরে এসে কিছুদিন পর চলে যান। এত ঘটনা ঘটে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কখনো আমরা বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত দুর্বলতা আছে অবশ্যই।

একজন উপাচার্যকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানব না, তাই কি হওয়া উচিত? কীভাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবর্তন আনবেন; কীভাবে তিনি অর্থায়ন করবেন; কীভাবে তিনি শিক্ষার মান বৃদ্ধি করবেন; কীভাবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বৃদ্ধি করবেন; কীভাবে ক্যাম্পাসকে উন্নত করবেন; কীভাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেবেন; কীভাবে তিনি শিক্ষকের গুণগত মান বৃদ্ধি করবেন; কীভাবে তিনি ন্যায় নিশ্চিত করবেন, সব পর্যায়ে এসব বিষয় জেনেই তো একজন উপাচার্যকে নিয়োগ দেওয়া উচিত। এটা শুধু নির্বাচনের বিষয় নয়। এ জন্য তো বিদেশে সার্চ কমিটি কাজ করে। একজন উপাচার্য নিয়োগ হবে তিনি কতটুকু যোগ্য তা নিয়ে কোনো পর্যালোচনা হবে না; তা কী করে হয়। আবার একজন পুনর্নিয়োগ পাবেন, তার অর্জন নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না এটাই বা কেমন নিয়ম! সব অধ্যাপকই ভালো উপাচার্য হবেন কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি শুধু সিটসংখ্যা বৃদ্ধি, হলের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। গুণগত পরিবর্তন হওয়া উচিত। এ নিয়ে ভাবনার সময় এখন। এক্সেলেন্সের জন্য যা যা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা উচিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত তা সময়ের আলোকে ঠিক হওয়া উচিত। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের দেখতে চাই। সেই আলোকে পরিবর্তন আনা উচিত। সরকারের উচিত বিষয়টি নিয়ে ভাবা। আমার এখনো মনে আছে, ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্টের সন্ধ্যায় বন্ধু শেখ কামালের সঙ্গে কলাভবনের সামনে আলোচনার কথা। দুজন বিভিন্ন বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম। পরের দিন বঙ্গবন্ধুর আসার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কামাল বলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথা। স্বপ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের করা। প্রতিবেশী ভারতে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং বিশ্বের প্রথম ১০০টির মধ্যে অনেকগুলো আছে। আমাদের নেই কেন? রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন যে আমাদেরও স্বপ্ন, তা বাস্তবায়িত হোক এটাই আমাদের সবার কামনা হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় সবকিছু করা উচিত। অনেকভাবে এটা অর্জন করা যায়। পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকে জানেন। প্রয়োজন শুধু খোলা মনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। সেই আশায় থাকলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি সবার কাম্য।

❑ এমএ বাকী খলীলী : সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়